Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-VI, Issue-II, October 2017, Page No. 41-50
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

বাংলা নাটকের নবযুগ : গণনাট্যের উদ্ভব

ড. অনল বিশ্বাস
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, পাঁচমুড়া মহাবিদ্যালয়, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ

Abstract

Realistic analysis in 'Kathasahitya' and 'kabyasahiyta' started from the beginning of thirties in twentieth century by the work of Kallol literature group. Similarly human characteristics, conscience and biological instinct influenced on these. Bengali 'Kathasahitya' and 'kabyasahiyta' outspreads its circumference up to the international horizon through the expression of realisation of the truth of life. But amazing truth is that Bengali drama could not synchronize itself with the vastness of life agony. The belief in Marxist philosophy, the influence of Russian Revolution and realistic urge of society motivated the playwrights to socialism. It was hindered by contemporary stages as those were highly professional and devoted to have success in any means. But Second World War and famine as its indispensible part made a drastic change. Millions of people were fighting for freedom. So to reflect the societal need it became a mandate for the playwrights to make a revolutionary change in their creation. Their creative drama should reflect day-to-day fight for existence of common men and their troublesome life, their anxiety, their hope, love along with their anger and story of togetherness. All these things enlightened the sky of contemporary drama. The plotting of the drama being changed from the rich (king, queen) to the poor middle class and their daily life-struggle, love and hope for a new society. This trend was popularly known as 'Gananatya'. IPTA (Indian people's theatre) which was cultural front of political party, established in 1943. Theatre movement of IPTA introduced a new trend of Bengali theatre in the beginning of forties.

First in 1944 at 'Sriragam' and in various parts of Bengal the drama 'Nabanna' was produced and performed at the doorsteps of downtroddens. 'Gananatya' became the mirror of society. It reflects the homeless hungry people's fight in the stage without any majestic makeover. So it touched the mind of common people to be united and fight through which they can create a new nation, new thought. The first production of IPTA is 'Aagun' written by Bijan Bhattacharya. Then 'Laboratory' (Binoy Ghosh), 'Homeopathy' (Manoranjan Bhattacharya), 'Jabanbandi'(Bijan), and finally 'Nabanna'. This journey may be called as beginning by 'Aagun', exploration by 'Jabanbandi' and formed a complete circle by 'Nabanna'.

Drama wasn't ended with distress but faded all obstacles through the power of ploughing of farmers. No surrendering to fate, no knee bending to urban rich, landlords and no

expectation from them; only self-belief of farmers and their fight for glory rejuvenates and brings new life to Bengali Drama.

বিংশ শতাব্দীর চারের দশকে গণনাট্যের হাত ধরে বাংলা নাটকে যে পালাবদল ঘটেছে, তা কোন আকস্মিক বিষয় নয়। বলা চলে তিনের দশক থেকেই তার সলতে পাকাবার কাজটি শুরু হয়েছিল।

নাট্যকার দিগিন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায়—

> *"ইতিহাসের দাবিতেই গড়ে উঠেছিল নয়া সাংস্কৃতিক আন্দোলন। নাটক, গান, নৃত্য প্রভৃতি শিল্পকর্মের ক্ষেত্রে এই চেতনা চল্লিশের দশকে প্রকাশ পেলেও আমাদের প্রগতিশীল লেখকদের তা আলোড়িত করেছিল ত্রিশের দশকেই।"*[১]

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়—

> *"একদিকে বিপ্লব ও রূপান্তরের বিশ্ববোধ, অপরদিকে ঘন ঘন জাতীয় আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গের নিষ্ফল আলোড়ন, একদিকে ফ্রয়েডের অবচেতন লোকের আবিষ্কার, অপরদিকে এঙ্গেলস মার্কসের দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের নবীন জ্ঞান তিরিশের উপান্তে এই জট পাকানো বাস্তব জীবনে গ্রন্থি মোচনের জন্য দুষ্পাঠ্য বাস্তবকে ব্যাখ্যা করার দায় ছিল ঔপন্যাসিকদের।"*[২]

কল্লোল সাহিত্য গোষ্ঠীর হাত ধরে তিনের দশকের শুরু থেকেই কথাসাহিত্যে যেমন বাস্তবধর্মী বিশ্লেষণ উঠে এসেছে, ঠিক তেমনি মানব চরিত্র-মনন-চেতনা ও জৈবিক কামনা-বাসনা ইত্যাদি বিচিত্র কৌতুহলী জিজ্ঞাসা অকুণ্ঠ ভাবে কাব্যসাহিত্যকেও একটা মোড়ে এনে ফেললো।

আমার পরাণে ভাই
কোটি মানবের অশ্রুজলের জোয়ার শুনিতে পাই
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

মিথ্যা দিয়ে সত্যকে আড়ালের কোন প্রচেষ্টা নেই। একটা পরিপূর্ণ মানুষের প্রাণের মূল্য আবিস্কারের উৎসাহ ছিল কল্লোলের ভিত। জীবনের সভ্যতার উপলব্ধি নির্দ্ধিধায় প্রকাশের মাধ্যমে বাংলা কথা এবং কাব্যসাহিত্য তার নিজস্ব পরিধিকে আন্তর্জাতিক দিগন্ত রেখা পর্যন্ত বিস্তৃত করল।

কিন্তু আশ্চর্যের হলেও সত্য এই যে বাংলা নাটক এই জীবন যন্ত্রণার বিশাল ব্যাপ্তির সঙ্গে তাল মেলাতে পারল না— রইল দূরে সরে। মার্কসীয় দর্শনে আস্থা, রুশ বিপ্লবের প্রভাব, যুগজীবনের তাগিদ - নাট্যকারদের সমাজতান্ত্রিক জীবনবোধের অংশীদার করতে চাইলো। বাধা হয়ে দাঁড়ালো সমকালীন মঞ্চ, যা পেশাদারী এবং সাফল্যসন্ধানীও বটে। তাই তিনের দশকে কোন কোন নাটক (মন্মথ রায়ের - কারাগার, মহুয়া, বিদ্যুৎপর্ণা, অশোক, মীরকাসিম; শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের - দশের দাবি, সংগ্রাম ও শান্তি, গৈরিক পতাকা, সিরাজদৌল্লা; বিধায়ক ভট্টাচার্যের মেঘমুক্তি, মাটির ঘর, রক্তের দাগ; রবীন্দ্রনাথ মৈত্রের মানময়ী গার্লস স্কুল; মহেন্দ্র গুপ্তের - বসুমিত্র, সোনার বাংলা প্রভৃতি)। মঞ্চ ব্যবস্থার মধ্যবর্তীতাকে মেনে নিয়েই কোন কোন সময় তাকে শুধুমাত্র স্পর্শ করার চেষ্টা করল মাত্র। আলিঙ্গন দিতে পারল না। এর জন্যে দরকার পড়ল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের উত্তাপ এবং তৎজনিত মন্বন্তরের। সারা দেশে লক্ষ লক্ষ মানুষের মুক্তির অভিপ্রায়কে ব্যক্ত করার জন্যে নাটকের রীতি আঙ্গিক ভঙ্গি ও বিষয়বস্তুর পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠল। বাস্তবের তাড়নায় বাংলা নাটকে এল নতুন যুগ, নতুন মানুষ। মন্বন্তরের অস্তিচর্মসার মানুষ থেকে শুরু করে জাতি-ধর্মকে ছাপিয়ে গ্রামীণ কৃষক, শ্রমিক-প্রত্যন্ত সাধারণ মানুষ। এদের সমস্যা জর্জরিত জীবনের হতাশা, দুঃখ-বেদনা বিড়ম্বনা এবং আশা-আকাঙ্ক্ষা-ভালবাসা সঙ্গে করে বিক্ষোভ ও সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলনকে হাতিয়ার করে দখল করল বাংলা নাট্যসাহিত্যের বিস্তীর্ণ আকাশ। পৌরাণিক নাটকের দেব-দেবী, ঐতিহাসিক নাটকের রাজারাণী, সম্রাট,

রোমান্টিক নাটকের রাজপুত্র-রাজকন্যা, পারিবারিক নাটকের কেতাদুরস্ত নায়ক-নায়িকা অথবা নৃত্যগীত বহুল প্রমোদনাট্যের সরণী থেকে নাটক নেমে এল মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত, বিত্তহীন সাধারণ শ্রমিক কৃষকের এঁদো গলিতে – বস্তিতে, ফুটপাতে, কাদাভরা মেঠো রাস্তায়। গণজীবনের কোলাহলে অবগাহন করল বাংলা নাটক। বাংলা নাট্যসাহিত্যের এই গণমুক্তিকামী ঝোঁকই খ্যাত হয়েছে 'গণনাট্য' নামে।

> *"কল্লোলের সঙ্গে নতুন নাট্য আন্দোলনের পার্থক্য অত্যন্ত স্পষ্ট। প্রথমত কল্লোলের উৎকট যৌনতাকে পরিহার করল গণনাট্য। দ্বিতীয়ত, রোমান্টিক ভাব বিলাসিতার স্থলে প্রাধান্য পেল বস্তুবাদী দৃষ্টি। তৃতীয়ত, কল্লোলের অস্পষ্ট শ্রেণী সংগ্রামের ধারণাকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত করে এক নতুন সমাজতান্ত্রিক বৈপ্লবিক আদর্শের বাণী প্রচারিত হল।"*[৩]

আর চারের দশকে এ সমস্ত প্রচারের দায়ও বহন করল 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ'।

গণনাট্য সংঘের এই দিকনির্দেশনার পশ্চাৎপটে যে সাংস্কৃতিক গণসংগঠনগুলোর ভূমিকা ছিল, সে বিষয়ে আলোচনা না করলে গণনাট্য আন্দোলনের তাৎপর্য অনুধাবনের ক্ষেত্রে ঘাটতি থেকে যাবে। "গণনাট্য সংঘের অন্যতম শরীক দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্ধ্যোপাধ্যায় সাম্প্রতিক কালে প্রকাশিত প্রবন্ধে 'গণনাট্য সংঘের ঐতিহাসিক ভূমিকা' মূল্যায়ণ প্রসঙ্গে লিখেছেন :

> *ইতিহাসের দাবিতেই গড়ে উঠেছিল নয়া সাংস্কৃতিক আন্দোলন। নাটক, গান, নৃত্য প্রভৃতি শিল্পকর্মের ক্ষেত্রে এই চেতনা চল্লিশের দশকে প্রকাশ পেলেও আমাদের প্রগতিশীল লেখকদের আলোড়িত করেছিল ত্রিশের দশকেই। ...ভারতের বুদ্ধিজীবী মহলের প্রগতিশীল অংশে এই ইতিহাসবোধ আসে, যা থেকে জন্ম নেয় 'প্রগতি লেখক সংঘ'।"*[৪]

উজবেকিস্তান রিপাবলিকের রাজধানী তাশখন্দ শহরে (সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্গত) ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের ১৭ই অক্টোবর ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির (প্রথম) ভিত্তিস্থাপন হয়েছিল।[৫] ১৯২৭-২৯ এর বামপন্থীদের নেতৃত্বে সারা ভারতে শ্রমিক শ্রেণির আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে। ধর্মঘট আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে একটা সংগ্রামী চেতনার প্রসার ঘটতে থাকে। সারা ভারতে শ্রমিক আন্দোলনের অগ্রগতি রোধ করার জন্য ব্রিটিশ সরকার খুবই তৎপর হয়ে ওঠে। ১৯২৯ এর ২০শে মার্চ মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার সূত্রে ৩১জন কমিউনিস্ট নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়।[৬]

১৯২৯ খ্রিস্টাব্দেই কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি তাদের সবচেয়ে বড় কাজ হিসাবে সামনে নিয়ে এলো – ফ্যাসিবাদকে রোখা এবং যুদ্ধবিরোধী মনোভাব গড়ে তোলা। এই কাজে সাংস্কৃতিক কর্মীদের গুরুত্ব দিয়ে 'কমিউনিস্ট পার্টির সংস্কৃতি চিন্তা এবং শ্রমিক শ্রেণির সাংস্কৃতিক ফেডারেশনের কাজ' নামে একটি পরিকল্পনা প্রকাশ করে বলে – সাংস্কৃতিক সংগঠনের কাজ হবে সমস্ত পচনশীল ঘৃণ্য জাতীয়তাবাদী মনোভাব ও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধবাদী মনোভাবের সক্রিয় বিরোধিতা করা।

আবার ১৯৩২ এর ১০ই জানুয়ারী আন্তর্জাতিক বিপ্লবী সাহিত্যিক সংঘের পক্ষ থেকে আহ্বান জানান হয় যাতে তাঁরা তাঁদের প্রতিভার ক্ষুরধার অস্ত্র নিয়ে স্বাধীনতা ও মুক্তি সংগ্রামে লিপ্ত সংগ্রামী মানুষকে রক্তাক্ত অত্যাচার থেকে রক্ষায় সচেষ্ট হন। ১৯৩৩-এ হিটলারের নাৎসী পার্টি জার্মানীতে ক্ষমতা দখল করলে জওহরলাল নেহরু ফ্যাসিবাদের বিপদ সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন – ফ্যাসিবাদ ইতালির কোন বিশেষ ব্যাপার নয়। এটা অন্য দেশেও ছড়িয়ে পড়েছে। যখন কোন দেশের শ্রমিকরা শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের কাছে বিপদ হয়ে দেখা দেয় গণতান্ত্রিক উপায়ে নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে তখন শাসক গোষ্ঠী পুলিশ ও সামরিক শক্তির সাহায্য নিয়ে তারা ফ্যাসিস্ত রাস্তা গ্রহণ করে। এরা শ্রমিক সংগঠনগুলিকে ধংস করে দেয় এবং অন্যান্য বিরোধীদের সন্ত্রস্ত করে রাখে। ইতিমধ্যে ১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দের ২৩ জুলাই কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ হয়। ১৯৪২-এর ২২ জুলাই পর্যন্ত নিষেধাজ্ঞা বলবৎ ছিল।

১৯৩৫-এ প্যারিসে ম্যাক্সিম গোর্কি, আন্দ্রেজিদ, ই এম ফষ্টার, আন্দ্রে মার্লো প্রমুখের নেতৃত্বের ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংস্কৃতি রক্ষার একটি সম্মেলন হয়। নাম হয় 'ওয়ার্ল্ড কমিটি ফর ষ্ট্রাগল্ এগেনষ্ট ফ্যাসিজম্ অ্যাণ্ড ওয়ার' - এর বিশ্ব কমিটির সভাপতি হলেন রমাঁ রল্যাঁ। কিছুদিন পরে রবীন্দ্রনাথকে সভাপতি করে এর ভারতীয় শাখা খোলা হয়। সেখান থেকে লেখকদের একটি আন্তর্জাতিক সংঘ গড়ে ওঠে জুনমাসে। অন্য দিকে আগষ্ট মাসে কমিউনিষ্ট আন্তর্জাতিকের সপ্তম কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত হয় - পুঁজিবাদী দেশগুলিতে ফ্যাসিবিরোধী বামপন্থী এবং ঔপনিবেশিক ও পরাধীন দেশগুলিতে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধ যুক্তফ্রন্ট গড়ে তোলার।

১৯৩৬-এর এপ্রিলে লক্ষ্নৌ কংগ্রেসের সময়েই 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি হন প্রেমচান্দ। আর ১১ জুলাই কলকাতার এলবার্ট হলে ম্যাক্সিম গোর্কির স্মৃতি সভায় বঙ্গশাখা গঠিত হয় 'বঙ্গীয় প্রগতি লেখক সংঘ'।

১৯৩৯-এ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হল। সারা পৃথিবী উত্তাল হয়ে উঠল। শেষে হিটলারের জার্মানি যখন সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত আক্রমণ করল তখন থেকেই ভারত সহ সারা ইউরোপ জুড়ে ফ্যাসিবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে শান্তির স্বপক্ষে বিশ্ববিবেক মুখর হয়ে উঠল। বিশ্বযুদ্ধের চরিত্রই গেল পালটে। বাংলায় গঠিত হল 'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি'।

১৯৪০-এ ইউথ কালচারাল ইনষ্টিটিউট (YCI) সাম্যবাদের পরিপূরক একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ইংল্যাণ্ড থেকে প্রত্যাগত কিছু তরুণই এর স্থপয়িতা। আর এর সহযোগী হয়েছিল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রগতিশীল ছাত্রদের একটি অংশ।

> *"১৯৪১-এ বোম্বাইতে গণনাট্য সংঘ গঠিত হয়। এর পুরো নাম Indian's People's Theatre Associations, সংক্ষেপে IPTA-ইপ্টা। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু তার উদ্দেশ্যে বলেন, ভারতের গণনাট্য আন্দোলনের উন্নতি বৃদ্ধিতে আমি অত্যন্ত আগ্রহশীল। জনগণ এবং এদেশের ঐতিহ্যের ভিত্তিতে তার বিকাশ হলে প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। অন্যথায় এটি হাওয়ায় ভাসবে। তোমাদের সার্কুলারে জনগণ সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গিতে আমি আনন্দিত। চীন ও স্পেনে এই আন্দোলন বিকাশের পক্ষে উপযুক্ত পরিবেশ আছে, কিন্তু আমাদের দেশে তার অভাব। তথাপি এদিকে চেষ্টা শুরু করা দরকার আর তাই আমি তোমাদের সাফল্য কামনা করি।"*[৭]

আর ১৯৪২-এর ৮ই মার্চ ঢাকার রাজপথে তরুণ বামপন্থী লেখক সোমেন চন্দের হত্যার প্রতিবাদে ২৮ মার্চ কলকাতায় গঠিত হল 'ফ্যাসি বিরোধী লেখক শিল্পী সংঘ'। দেখতে গেলে 'ইউথ কালচারাল ইনষ্টিটিউট' (YCI), প্রগতি লেখক সংঘ, সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি, ফ্যাসিবিরোধী লেখক শিল্পী সংঘ ইত্যাদি একই রূপই আমরা পেলাম - 'ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের' মধ্যে। বাস্তবিক পক্ষে এটা দলেরই সাংস্কৃতিক ফ্রন্ট। গণনাট্য সংঘের নাট্য আন্দোলনের মধ্যে দিয়েই চারের দশকে বাংলা নাটকের নতুন ধারাটির সূত্রপাত হয়।

ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের ঐতিহাসিক ভূমিকার মর্মার্থ বিশ্লেষণ করে দিগিন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—

> *ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘকে কোন একটি বিশেষ গোষ্ঠী বলে ভাবলে ভুল করা হবে। চল্লিশের দশকে এটা গড়ে ওঠে এক সর্বভারতীয় নয়া সাংস্কৃতিক আন্দোলন রূপে। আসমুদ্র হিমাচল এতে আলোড়িত হয়। ...সাংস্কৃতিক ভারতের একটা সামগ্রিক রূপ ফুটে উঠতো গণনাট্য সংঘের প্রতিটি সর্বভারতীয় সম্মেলনে ও তার নাট্য উৎসবে। প্রতি রাজ্যের শিল্পকলা ও সংস্কৃতির সাক্ষাৎ পাওয়া যেত সেখানে। নাম গণনাট্য সংঘ হলেও কেবল মঞ্চ নাট্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। তার সৃষ্টি-সংগীত, নৃত্য, ছায়া নাট্য, কবিগান, উর্দ্দু কবিতায় মুশায়েরা প্রভৃতিও ছিল তার অন্যতম অঙ্গ। রূপে রসে, ছন্দে সুরে ভারতীয় সংস্কৃতির এক মহামিলনক্ষেত্র হয়ে উঠতো গণনাট্যসঙ্ঘের প্রতিটি উৎসব।"*[৮]

অন্য একটি প্রবন্ধে বলেছেন—

> *"সৃষ্টিতে যত বৈচিত্র্যই থাক না, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সেই একটি বোধই (Proletarian Humanism) কাজ করছে।"*[৯]

১৯৪৪-এর অক্টোবরে শ্রীরঙ্গম মঞ্চে প্রথম এবং পরবর্তীতে অখণ্ড বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে 'নবান্ন' নাটকের প্রয়োজনা বাংলা নাটককে নিয়ে এল গণমানুষের বেদীতলে। একদিকে বুভুক্ষু শ্রীহীন মানুষের অকুণ্ঠ পদচারণা তো, অন্যদিকে নাটকে নতুন বিষয়বস্তু, বাস্তব ঘটনা আর বিপ্লবী আদর্শ। একদিকে চটহীন-রংহীন সজ্জায় আভরণহীন পশ্চাৎপট তো অন্যদিকে সংঘবদ্ধ মানুষের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রতিরোধ এবং সংঘবদ্ধ মানুষের অন্তিম জয়। গণনাট্য সংঘের নাটকগুলিকে বাংলা নাটকের গতানুগতিক ধারা থেকে স্বতন্ত্র শিল্পাদর্শ হিসাবে স্বীকৃতি দিল।

১৯৩৬-এ প্রতিষ্ঠিত 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সঙ্ঘে'র প্রকাশিত ইস্তাহারটি ছিল গণনাট্য আন্দোলনের পথ নির্দেশক—

> *"ভারতের নবীন সাহিত্যিক আমাদের বর্তমান জীবনের মূল সমস্যা ক্ষুধা, দারিদ্র্য, সামাজিক পরাঙ্মুখতা, রাজনৈতিক পরাধীনতা নিয়ে আলোচনা করতে হবে। ...যা কিছু আমাদের বিচারবুদ্ধিকে উদ্বুদ্ধ করে, সমাজ ব্যবস্থা ও রাজনীতিকে যুক্তিসঙ্গতভাবে পরীক্ষা করে আমাদের কর্মিষ্ঠ, শৃঙ্খলাপটু ও সমাজের রূপান্তরক্ষম করে, তাকে আমরা প্রগতিশীল বলে গ্রহণ করব।"*[১০]

এই প্রগতিশীলতার প্রথম প্রকাশ বাংলার নাট্যপ্রেমীরা পেল গণনাট্য সংঘের প্রথম প্রযোজনা বিজন ভট্টাচার্যের নাটক 'আগুন'-এর মধ্যে দিয়ে। সঙ্গে সঙ্গেই অভিনীত হল বিনয় ঘোষের 'ল্যাবরেটরী'। এর পর এল মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের 'হোমিওপ্যাথি' এবং বিজনের 'জবানবন্দী' এবং এই বৃত্তটি যেন সম্পূর্ণ করল বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটকটি। "বলা যায় 'আগুন'-এ সূচনা, 'জবানবন্দী'তে বিকাশ এবং 'নবান্ন'তে পূর্ণতা।"[১১]

গণনাট্য সংঘের প্রথমপ্রয়াস - 'আগুন'। মোট পাঁচটি দৃশ্য। প্রথমটিতে - সাধারণ সব্জি বিক্রেতা পরিবার, দ্বিতীয় দৃশ্যে - কৃষক পরিবার, তৃতীয় দৃশ্যে কারখানার শ্রমিক পরিবার - এবং চতুর্থ দৃশ্যে কেরানি হরেকৃষ্ণ বাবুর মধ্যবিত্ত পরিবার। বিভিন্ন শ্রেণির চারটি পরিবারের সমস্যা এক - চাল, চালের আকাল। পঞ্চাশের মন্বন্তরের কিছু আগেই খাদ্যমজুত করে কৃত্রিম খাদ্যাভাব সৃষ্টির বিষয়টি তার সমস্যা নিয়ে এ নাটকে এসে হাজির হয়। চারটি খণ্ড দৃশ্যপটের মধ্যে দিয়ে বিজন সমস্যার সংকটময় রূপটি দর্শকের সামনে নিয়ে আসতে সমর্থ হয়েছেন। পঞ্চম বা পরিণতি দৃশ্যে - আরো বহুর সঙ্গে চালের লাইনে দাঁড়িয়ে বহুবিধ সমস্যা অপমান পুলিশের অযথা খবরদারি, দোকানির অপমানজনক মন্তব্য ইত্যাদির পাশাপাশি লাইনে দাঁড়ানো নিয়ে নিজেদের মধ্যে মৃদু গোলমোল এবং একে অপরের হয়ে কথা বলায় কিছুটা প্রতিবাদী হয়ে ওঠায় পুলিশ এবং দোকানি দুই-ই কিছুটা নরম হয় এবং মোটামুটি সকলেই চাল পেয়ে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারে এবং সকলেই বুঝতে পারে - এক না হলে চলবে না।

৩য় পুরুষ। আর মনে করাকরিই বা কেন। যথেষ্ট তো হয়েছে। এখন বাঁচতে হবে। বাঁচতে হলে মিলেমিশে থাকতে হবে ব্যাস্।

হরেকৃষ্ণ। (বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে) এই বুঝটাই এখন দরকার।

৩য় পুরুষ। তা ছাড়া উপায় নেই, কোনো উপায় নেই।[১২]

এই উপলব্ধি-ই এই ছোটগল্প-কল্প নাটক 'আগুন নাটকের প্রধান প্রাপ্তি' - বাঁচতে হলে জোট বাঁধতে হবে।

বিনয় ঘোষের 'ল্যাবরেটরী'তে দেখতে পাওয়া যায় দেশের দুর্দিনে, সাধারণ মানুষের দুর্দিনে বৈজ্ঞানিকেরাও গবেষণাগার থেকে বাইরে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হয়। বাধ্য হয় দৈনন্দিন জীবন সংগ্রামের পটভূমিকায় রাজনীতির

হাতেখড়ি নিতে। আর 'হোমিওপ্যাথি' নাটকে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য দেখান হিন্দু মুসলমান অধ্যুষিত পূর্ববঙ্গের একটি গ্রামের চিত্র। যেখানে বেয়াক্কু ধর্মান্ধতা, অজ্ঞতা ও গোরামি হাত ধরাধরি করে চলে। সেই হিন্দু-মুসলমানই কেমন করে বিপদের দিনে সমস্ত কালোকে ছিন্ন করে একে অপরের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে পরম বিশ্বাসে। জোট বাঁধে - মোকাবিলা করে সঙ্কটের।

তিনটি ছোট নাটিকার পর অপেক্ষাকৃত বিষয় বিস্তারি নাটক 'জবানবন্দী'। আগুন নাটক শেষ হয় মন্বন্তরের পূর্বাবস্থা রেশনের কিউয়ে। আর 'জবানবন্দী'তে সেই মন্বন্তর এসে পড়ে জীবনের মাঝ বরাবর। কৃষক হয় গ্রামছাড়া। চারটি দৃশ্যের প্রথমটি গ্রামে - ক্ষুধার তাড়নায় বাঁচার আশায়, পরিবারকে বাঁচাবার আশায় গ্রাম থেকে আসা তিনটি পরিবারের জীবন অথবা মরণ চিত্র দিয়ে নাট্যকার বিজন দুর্ভিক্ষের এক মর্মান্তিক ছবি এঁকেছেন। বৃদ্ধ পরাণ মণ্ডল, তার স্ত্রী, দুই ছেলে বেন্দা ও পদা, বেন্দার স্ত্রী এবং ছেলে মানিক-এর সঙ্গে একটি হিন্দু মুসলিম পরিবার (একটি রাইচরণের অপরটি রমজানের) সংসার পাতে শহরের ফুটপাতে। ক্ষুধার জ্বালায় মানুষের মানবিক সম্পর্কগুলো কেমন যেন নষ্ট হতে থাকে - মানুষ যেন শুধুমাত্র ক্ষুন্নিবৃত্তিকারী পশুতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। শহুরে সভ্যতার নিষ্ঠুর কাঠিন্যে গ্রামের কৃষক পরিবারের স্বপ্ন ভেঙ্গে দেয়। বেন্দার ছেলে শিশু মানিকের মৃত্যু হয় অনাহারে বিনা চিকিৎসায়। শহুরে বাবুদের লোল দৃষ্টি পড়ে বেন্দার বউয়ের উপর। সে বিপথগামী হতে চায়। ক্ষুধায় শোকে মোহভঙ্গে গ্রামের কৃষক পরান মণ্ডল অসুস্থ হয়ে পড়লে - নাটকের চতুর্থ দৃশ্যের কিছু উদ্ধার করা যেতে পারে।

বেন্দা।। (গালে হাত দিয়ে বসে নিঃশব্দে কাঁদে। হঠাৎ সখেদের\ হাত উলটে)। কোনোই কুল পাচ্ছিনে।
(ক্ষোভের সুরে চেঁচিয়ে) বাপ কি তাহলি আমাদের মরে যাবে রে পদা?
(পদা কোনো কথা কয় না। বেন্দার দিকে চেয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।)
রমজান।। কাঁদিসনি বেন্দা। ও মোড়লের পেছনে পেছনে আমরাও যাব। দুদিন আগে আর পরে।
বেন্দা।। (একটু ঝিম ধরে থেকে) দুদিন আগে আর পরে।
পদা।। (গম্ভীরভাবে) ষাট বছর ধরে বাপ আমার সোনা ফলিয়ে এয়েছে মাথালের মাটিতি। শহর-বাজারে আজ যে শব চালিডালির খয়রাতি হচ্ছে, ইরির মধ্যি পরান মণ্ডলেরও হয় তো কিছুডা দান আছে। কিন্তু কেউ আজ সে কথাডা স্বীকার কল্লে না। পরান বরবাদ। না খেতি পেয়ে আজ তারে রাস্তায় পড়ে মরতি হচ্ছে।
বেন্দা।। (গম্ভীর উদাত্ত কণ্ঠে) চারিদিকি এত সম্পদ, এত ধনদৌলত অথচ এই পিরথিমিতি পরান মণ্ডলের বেঁচে থাকবার কোন অধিকার সাব্যস্ত হল না।
রাইচরণ।। (হাত উলটে) কত আশা করেই না এইছিলাম এই শহরে, হুঁ:। দেশে পড়ল আকাল, ভাবলাম বলি যাই, কত লোকই তো গেছে শহরে; না খেতি পেয়ে আর মরব না। তা যে এই অবস্থা হবে তা কি ভেবেছি কখনও।[১৩]

তবে এই হতাশার মধ্যেই নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটে না। শেষ পর্যন্ত কৃষকের মাটিকর্ষণের শক্তির কাছেই যেন ম্লান হয়ে যায় সমস্ত বাধা বিপত্তি। তাই শুধুমাত্র ভাগ্যের কাছে আত্মসমর্পণ নয়, শহুরে বিত্তবান ভদ্রলোকেদের দয়ার প্রত্যাশাও নয় পক্ষান্তরে কৃষকের নিজেদের আত্মবিশ্বাসী উচ্চারণে এ নাটকের শেষে যেন জীবনেরই শুরু হয়। তাইতো মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে বৃদ্ধ কৃষক পরান মণ্ডল জবানবন্দী করে যায়—

বৃদ্ধ পরান।। (হাত দিয়ে যাবার ইঙ্গিত করে) ঘরে ফিরে যা রমজান - তোরা শব ঘিরে যা, ঘরে ফিরে যা। আমার আমার সেই মরচেপড়া লাঙ্গল কখানা আবার শক্ত করে, শক্ত করে চেপে ধরগে মাটিতি। শক্ত করে চেপে ধরগে মাটিতি। খুব শক্ত করে চেপে ধরবি। সোনা ফলবে, সোনা ফলবে। ফিরে যা। ফিরে যা। (পাগলের মতো) বেন্দা বেন্দার মা বেন্দার মা বেন্দার মা।[১৪]

গণনাট্যের সূচনাবৃত্ত এবং বিজনের মন্বন্তর বিষয়ক নাটকের বৃত্তটি পূর্ণ করতেই আমরা পেলাম 'নবান্ন'। এই 'নবান্ন'র মধ্যেই বলিষ্ঠভাবে অঙ্কুরিত হল আগামী দিনের নাট্য আন্দোলনের বীজ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ভারতের অর্থ ও

সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহারের ফলে দেশব্যাপী দেখা দেয় অর্থনৈতিক চরম বিপর্যয়। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর যুদ্ধনীতিতে দেশব্যাপী রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দেয়।' ৪২-এর আগস্টে ভারত ছাড় আন্দোলন সারা দেশে তীব্র হয়ে ওঠে। নবান্ন নাটকের প্রথম দৃশ্যেই আগষ্ট আন্দোলনের দমনের নির্মমতা এবং প্রতিবাদ-প্রতিরোধের চিত্রটি স্পষ্ট হয়। তবে আগষ্ট আন্দোলন দিয়ে শুরু হলেও এই নাটকের প্রেক্ষাপটও '৪৩-এর সেই মহা মন্বন্তর। গ্রামের চাষীরা স্ত্রী সন্তান সহ দু'মুঠো ভাতের আশায় দলে দলে শহরে চলে আসে। বুভুক্ষুর হাহাকারে ভরে যায় কলকাতার রাজপথ। মেদিনীপুর জেলার আমিনপুরের কৃষক প্রধান সমাদ্দরের পরিবারকে ঘিরে আবর্তিত হলেও এ নাটকে দেখা যায় গ্রামের সমস্ত নারী পুরুষই এসে ভিড় করেছে তাদের চারপাশে। চাষী সমাজের দুঃখ-দুর্দশা, শোষণ-বঞ্চনার কথা নিয়েই গড়ে উঠেছে দৃশ্যগুলি। দুর্ভিক্ষের হাহাকার, শহুরে বিত্তবানদের বিবেকহীনতা, ভিখিরির দুর্বিষহ জীবন, লঙ্গরখানার আশ্রয় প্রভৃতি নানা বেদনাদীর্ণ অভিজ্ঞতা নিয়ে বেঁচে থাকা গ্রামের মানুষগুলি কিন্তু শেষ অবধি গ্রামেই ফিরে আসে। মন্বন্তর পীড়িত দুর্বল রুগ্ন গ্রামবাসীরা ক্রমে বোঝে সমস্যা সকলের। তাই সকলে মিলে রুখে দাঁড়াবে, একা একা নয়। সিদ্ধান্ত নেয় সকলে মিলে গাঁতায় খাটবে। সবার ফসল সবাই মিলে তুলবে। আর জমিদারের কৃপা ভিক্ষা কিংবা ওপরওয়ালাদের উপর নির্ভর করে নয়; নিজেদেরই একটা কিছু করতে হবে। তাই নাটকের পরিণতিতে প্রতিরোধের সংকল্প নিয়ে দয়ালের উক্তি—

দয়াল। জানি প্রধান, মানি তোমার আকাঙ্খা কিন্তু এ কথাও জেনো প্রধান, যে গতবারের মতো এবার আর আকাল আচম্বিতে এলে, আমার চোখের ওপর থেকে আমারই পরিজন, আমারই স্বজন, আমারই বন্ধুবান্ধব, (জনতার দিকে হাত তুলে দেখিয়ে) এই এরাই তো আমার আত্মীয় পরিজন ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না এদের। কিছুতেই না। এদের নিতে হলে আগে আমাকে নিতে হবে, আমারে ঘায়েল করতে হবে, এট্টা ব্যবস্থার ওলট-পালট করে ফেলে দিতে হবে প্রধান, তবে, যদি পারে। জোর, জোর প্রতিরোধ প্রধান এবার। জোর প্রতিরোধ। জোর প্রতিরোধ।[১৫]

এই জোর প্রতিরোধের দৃঢ় প্রত্যয়ের মধ্যে দিয়েই নাটকের সমাপ্তি ঘটে।

'নবান্ন' নাটক শুরুই হয় পুলিশি আক্রমণের বিরুদ্ধে গ্রামবাসীর প্রতিরোধের দৃশ্যে। ৪২-এর আগষ্টে ভারতছাড়ো আন্দোলনে বাঙালির প্রতিরোধ ও আত্মোৎসর্গ ইতিহাস স্বীকৃত ঘটনা। সেই আন্দোলনে প্রধানের দুই জোয়ান পুত্র শ্রীপতি-ভূপতি মারা যায়। স্ত্রী পঞ্চাননী নারীর উপর পুলিশি অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে বলে—

পঞ্চাননী।। (লাঠি ভর দিয়ে ত্বরিতপদে) না এর এট্টা বিহিত করতে হয় কুঞ্জ, বুঝলে, এর এট্টা বিহিত করতে হয়। এ কী রকম ধারা কথা? মেয়েমানুষ, লজ্জাশরম খুইয়ে শব বনে-জঙ্গলে গিয়ে বসে থাকবে পহরের পর পহর। কেন, বিত্তান্তটা কী। দেশে পুরুষমানুষ নেই, হ্যাঁ রা কুঞ্জ?

কুঞ্জ।। জেঠিমা তুমি।
পঞ্চাননী।। হ্যাঁ আমি, তুই জবাব দে আগে আমার কথার।
কিঞ্জ।। বলো
পঞ্চাননী।। আবার বলবে কী? দেখছিস নে, না খেয়ে বসে আছিস চোখের মাথা! বলি তোদের এই অক্ষমতার জন্যে মেয়েমানুষ কেন সহ্য করতে যাবে এই দুর্ভোগ? মেয়েমানুষ কী পাপ করেছে য়্যাঁ!
কুঞ্জ।। কী বলব।
পঞ্চাননী।। কী বলবি!
প্রধান।। সহ্য করতে এয়েছ সহ্য করে যাও। মুখ বুজে সহ্য করে যাও, কোনো কথা কয়ো না। কোনো কথা কয়ো না, অধর্ম হবে। মুখ বুজে...
পঞ্চাননী।। তার আর বলবে কী। আজ তিন দিন দাঁতে এট্টা কুটো কাটিনি, বুঝলে! শরীরের কষ্ট আমরা সহ্য করতে পারি। সে কোনো কথা না। কিন্তু শরম!! লজ্জা!! তোমাদের দেশের মেয়েমানুষের অঙ্গের ভূষণ!! যা নিয়ে তোমরা

গর্ব কর!! আর তারপর সব চাইতে বড়ো কথা ইজ্জৎ!! মেয়েমানুষের ইজ্জৎ!! কী, কথা বলিস না যে! চুপ করে থাকিস কেন, হ্যাঁ রা কুঞ্জ, কুঞ্জ, কুঞ্জ!! !! !![১৬]

নিজেদের সমাজের নারীর সম্মান রক্ষায় অক্ষম পুরুষদের ধিক্কার জানায় পঞ্চাননী। গ্রামের মানুষজনকে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়ে শাসকের অত্যাচারের প্রতিবাদ সামিল করে। পুলিশের গুলি খেয়ে মৃত্যুমুখেও অকুতোভয় পঞ্চাননী মাটিতে লুটিয়ে পড়েও বলতে থাকে—

পঞ্চাননী।। এগিয়ে যা, এগিয়ে যা তোরা সব। এগিয়ে যা

(জনতা সমবেত কণ্ঠে বন্দে মাতরম ধ্বনি করে খানিকটা এগিয়ে আসে।)

এগিয়ে যা এগিয়ে যা তোরা!

(নেপথ্যে বাঁশের গাঁট ফাটার শব্দ! জনতা একটু ইতস্তত করে।)

এগিয়ে যা, এগিয়ে চল্ তোরা সব, এগিয়ে যা।

(নেপথ্যে বাঁশের গাঁট ফাটার শব্দ! জনতা থমকে দাঁড়ায়।)

জনৈক ব্যক্তি (ঘা খেয়ে)।। আরে বাস রে, বাপ্ রে বাপ্।

(সকলে সমবেত কণ্ঠে এই-ই-ই শব্দ করে পিছিয়ে যায়।)

পঞ্চাননী।। আমিনপুরের কলঙ্ক, আমিনপুরের কলঙ্ক তোরা সব, তাই পেছু হটছিস। পেছোসনি, এগিয়ে যা। এগিয়ে যা তোরা সব, এগিয়ে যা।

(সমবেত কণ্ঠে ও-ও-ও শব্দ করে জনতা এগিয়ে যায়।)

এগিয়ে যা, এগিয়ে যা সব। ...

(নেপথ্যে বাঁশ ফাটার বিরামহীন শব্দ। পঞ্চাননী মাটিতে লুটিয়ে পড়ে কপালে হাত চেপে ধরে।)

এগিয়ে যা, এগিয়ে যা...

(মুহ্যমান হয়ে পড়ে পঞ্চাননী। সকলে মালভূমির ওপর দিয়ে সামনের দিকে ছুটে যায়। দু-একজন মাটিতে পড়ে হাত-পা ছুঁড়তে থাকে।)

(ক্ষীণ কণ্ঠে) এগিয়ে যা, এগিয়ে যা তোরা সব...

(দুই একটা জ্বলন্ত মশাল মাটিতে পড়ে থাকে। হাতিয়ার সব ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। গোলমাল ক্ষীণ হয়ে আসে।

পঞ্চাননীর মুখে কথা সরে না, শুধু হাত দিয়ে ইঙ্গিতে বলতে থাকে - এগিয়ে যা, এগিয়ে যা, এগিয়ে যা তোরা সব।)[১৭] পঞ্চাননী প্রতিবাদ সঞ্চারিত হয় কুঞ্জ ও প্রধানের মধ্যে। শোষকের প্রতিনিধি হারু দত্ত মহাজন ও জোতদাররূপে গ্রাস করে নিতে চায় আমিনপুর গ্রামের মানুষদের জমি বাড়ি। হারু দত্তর করাল থাবা থেকে রেহাই পেতে কুঞ্জর প্রতিবাদী কণ্ঠ শোনায়—

প্রধান।। (কুঞ্জকে বাধা দিয়ে) আ-হা-আ, তুই চুপ কর্ দিনি কুঞ্জ!

কুঞ্জ।। (চেঁচিয়ে) কেন চুপ করার কী হয়েছে! চুপ করবে! এই চুপ করে থাকতে থাকতে একেবারে বোবা হয়ে যাবে, বোবা হয়ে যাবে এই বলে দিলাম, হ্যাঁ।

প্রধান।। তা সে যাই যাব, তুই চুবো।

কুঞ্জ।। কেন, কিসের জন্যে! গলা দিয়ে এইবার এট্টা রা কাড়ো বুঝলে—চেঁচাও -অন্তত আর পাঁচ জন মানুষ জানুক।

প্রধান।। আ-হা-আ, তুই চুপ কর দিনি কুঞ্জ!

কুঞ্জ।। চুপ করবে!

হারু দত্ত।। কথার যে বড়ো পাঁয়তারা দেখি, উঁ।

কুঞ্জ।। তবে, এখনও ভয় করে চলতে হবে! এখনও ভয়!

হারু দত্ত।। উঁ, তা সে আমারে ভয় না করে—

ওপরে হাত তোলে

কুঞ্জ।। জানি জানি, ওপরের দিকে হাত দ্যাখাবে, তা জানি। তা সে বিশ্বাস ভেঙে গেছে; ওতে আর ভয় করিনে।
(প্রধান বলিষ্ঠ কণ্ঠে হারু দত্তকে জানায়) ... 'তা আপনি যান বাবা! একতো জমি, তো সে আমি বিক্রি করব না। ফুরিয়ে গেল!'[১৮]

দ্বিতীয় অঙ্কের দৃশ্যগুলোতে শোষণ ও দুর্ভিক্ষের ভয়ঙ্কর রূপের মধ্যেই পঞ্চম দৃশ্যে নিরঞ্জনের প্রতিবাদী রূপের পরিচয় পাই আমরা। বাখহরি ছদ্মনামে কালীধন ধাড়ার চালের আড়তে কাজ করা নিরঞ্জন কালীধনের মজুতদারি ও কালোবাজারির খবর আর সেবাশ্রমের নামে মেয়ে পাচারের গোপন কারবাবের কথা জেনে যায়। এই কালীধনের সহযোগী রূপে হারু দত্ত গ্রামের চন্দরের দুই মেয়েকে সেবাশ্রমে নিয়ে এলে নিরঞ্জন নিশ্চিত হয় এবং ঘটনাচক্রে তার স্ত্রী বিনোদিনীকে সেখানে দেখে ক্ষোভে ও প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। হারু দত্ত ও কালীধন ধাড়াকে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। কিন্তু নাট্যকার পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে এই আড়তদার মহাজনদের গাঁটছড়া বাঁধার দিকটিও দেখাতে ভোলেননি।

চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে দেখা যায় নিরঞ্জন দয়াল বরকত সখীচরণ সকলে মিলে পরামর্শ করে একটা যৌথ নেতৃত্ব গড়ে তোলে বাঁচার তাগিদে। গ্রামের প্রত্যেকের জমিতে সকলে মিলে 'গাঁতায় খেটে' নতুন ধান তুলে দেবার প্রতিজ্ঞা করে। প্রতিরোধের সংকল্প উঠে আসে জোটবদ্ধ কৃষকদের অন্তর থেকে। ভবিষ্যতের আকালের মোকাবিলায় 'ধর্মগোলা' তৈরি করে প্রত্যেকের ধানের কিছু অংশ জমা রাখার শপথ নেয়।

দয়াল।। বেশ তো আবেদন-নিবেদন করতে থাকো না কেন, বারণ করছে কে! খাজনা-পত্তর মকুব চাই, বীজধান চাই, কৃষিঋণ চাই, এ সব তো আছেই; তবে আমার কথা হচ্ছে যে, প্রথম থেকেই একেবারে ওপরওয়ালাদের ওপর নির্ভর করে না থেকে নিজেরা কতটুকখানি কী করতে পার তাই ভাবো - যা দিয়ে যা হবে।

দিগম্বর।। হ্যাঁ প্রথম থেকেই একেবারে চাতকপাখির নাগাল হা-পিত্যেশে ওপরের দিকে চেয়ে থাকা, ওতে কোনো কাজ হবে না।
সখীচরণ।। হ্যাঁ।
মানিক।। না ও মিথ্যে। অনাহক—
দয়াল।। আচ্ছা এক কাজ করলে কেমন হয়!
উৎকর্ণ হয়ে ওঠে সকলে।
বিষয়ডা অবশ্য ভালো করে বিবেচনা করে দেখতে হবে সকলে মিলে।
ধনি ওঠে - 'কি বিষয়, কী বলতে চাও তুমি;, ইত্যাদি
বলছি বলি সকলে মিলে গাঁতায় খাটলে কেমন হয়।
বরকত।। গাঁতায় খাটলে।
দয়াল।। হ্যাঁ। ধর এই আমিনপুর গ্রামের কথাই বলি। কম পক্ষে চল্লিশ পঞ্চাশ ঘর গেরস্তর এখানে বাস। এখন কাজের সময় আমরা যে ঠিক এই পঞ্চাশ ষাট ঘর গেরস্তেরই সাহায্য পাব, এমন কথা বলি নে। কারণ অসুখ আছে, বিসুখ আছে, রোগ, শোক ইত্যাদি আরও পাঁচটা দৈব দুর্ঘটনা আছে, এ আছে। তবু এখন কথা হচ্ছে যে, এই পঞ্চাশ জনার অর্ধের অতি কম পঁচিশ ঘর গেরস্তের সাহায্যও যদি আমরা পাই এবং প্রত্যেকের জমিতে আমরা যদি সকলে মিলে গাঁতায় খাটব বলে পিতিজ্ঞে করি, তা হলে আমার খুব বিশ্বেস যে, একদানা ফসলও কারো জমির নষ্ট হতে পারবে না। দশ হাতে অনায়াসে এ ফসল আমরা গোলায় তুলে ফেলতে পারব।

প্রত্যেকেই প্রত্যেকের দিকে তাকিয়ে হাবভাবে আকারে ইঙ্গিতে কথাবার্তায় সমর্থন করে দয়াল মণ্ডলের যুক্তি।

...
দয়াল।। এই। আসল কথা হল ফসল, সেটা যাতে নষ্ট না হয় তার তো একটা ব্যবস্থা করতে হবে সবার আগে!

সুজন।। না সে কথা তো একশ বার।
দয়াল।। তো তবে! এক এক করে এস।
দিগম্বর।। না সে গাঁতায় খাটলে পরে - তা কী বল তোমরা সব? স্বীকার আছো তো খাটতে গাঁতায়? সাদা মনে বলবে কিন্তু।
সকলে সমস্বরে 'নিশ্চয় খাটব', 'খাটব গাতায়' ধনি করে।[১৯]
আগেই ফিরে এসেছে কুঞ্জ এবং রাধিকা আর শেষ দৃশ্যে নবান্ন উৎসবের সূচনায় প্রধান সমাদ্দার গ্রামে ফিরে এলে দয়ালদের এই প্রচেষ্টা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করলে প্রধানের সঙ্গে দয়ালের যুক্তিনিষ্ঠ সংবেদনশীল কথোপকথন—
দয়াল।। ডর আছে, কিন্তু প্রধান, মন্বন্তরের দাপটও তো গিয়েছে এই মাথার ওপর দিয়ে মরিনি তো সবাই আমরা! আমরা তো সব বেঁচেই আছি। এই যে তোমার কুঞ্জ, নিরঞ্জন, এই যে বরকত, সখীচরণ। চেনো তো সব এদের? কই মরিনি তো আমরা সবাই মন্বন্তরে।
প্রধান।। মরনি, মরনি মন্বন্তরে, ভালো। ভালো। ভালো। কিন্তু দয়াল, মন্বন্তর যদি আবার আসে! আবার যদি আসে সেই মন্বন্তর!
(গুরু গুরু মেঘের আওয়াজ। জলভরা কালো মেঘের একটা অংশ উঠে এল উৎসব অঙ্গনের এক-চতুর্থাংশের ওপর কালো ছায়া ফেলে।)
(মেঘের দিকে লক্ষ্য করে) এই দ্যাখো, নীচে এই উৎসব, কত আহ্লাদ, কত আনন্দ, কিন্তু আবার ওই ওইখানে, ওই ওপরে, দ্যাখো কত বড় একটা গোলযোগ গুঁড়ি মেরে এগিয়ে আসছে। কত বড়ো একটা গোলযোগ! কত বড়ো একটা—
(বিকৃত মুখে মাথা নাড়তে লাগল।)
দয়াল।। জানি প্রধান, মানি তোমার আশঙ্কা। কিন্তু এ কথাও জেনো প্রধান, যে গতবারের মতো এবার আর আকাল আচম্বিতে এসে, আমার চোখের ওপর থেকে আমারই পরিজন, আমারই স্বজন, আমারই বন্ধুবান্ধব (জনতার দিকে হাত তুলে দেখিয়ে) এই এরাই তো আমার আত্মীয় পরিজন, ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না এদের। কিছুতেই না। এদের নিতে হলে আগে আমাকে নিতে হবে, আমারে ঘায়েল করতে হবে, এট্টা ব্যবস্থার ওলট-পালট করে ফেলে দিতে হবে প্রধান, তবে, তবে যদি পারে। জোর, জোর প্রতিরোধ প্রধান এবার। জোর প্রতিরোধ। জোর প্রতিরোধ।
প্রধান।। (জোরে চিৎকার করে ফেটে পড়ে জড়িয়ে ধরে দয়ালকে) দয়াল![২০]

জাতপাতের ভেদাভেদ ভুলে হিন্দু মুসলমান 'দোস্তালি পাতিয়ে' নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থদ্বন্দ্ব ভুলে জোটবদ্ধ জনশক্তির প্রতিরোধের মধ্যেই 'নবান্ন' নাটকের সমাপ্তি ঘটে।

তথ্যসূত্র :

১। শারদীয়া নতুন পরিবেশ, ১৩৮০, পৃঃ ৬০-৬১
২। মহবুল আলম, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১৯৯৭, পৃঃ ৭
৩। ড. দীপক চন্দ্র - বাংলা নাটকে আধুনিকতা ও গণচেতনা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, পৃঃ ১৪৯
৪। তদেব
৫। মুজাফ্ফর আহমেদ - আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, ১৯৬৯, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, পৃঃ ৩৩
৬। সরল চট্টোপাধ্যায় - ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমবিকাশ, রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৯০, পৃঃ ২২০
৭। সুধী প্রধান - সাংস্কৃতিক প্রগতি, গ্রুপ থিয়েটার, পঞ্চদশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, পৃঃ ৪৫৭
৮। শারদীয়া নতুন পরিবেশ, ১৩৮০, পৃঃ ৬০

৯। তদেব, পৃঃ ৬১
১০। মোঃ জাকিরুল হোক - দুই বাংলার নাটকে প্রতিবাদী চেতনা, পৃঃ ৯
১১। তদেব, পৃঃ ১০
১২। বিজ্ঞান ভট্টাচার্য - রচনা সংগ্রহ (১), ২০০৮, দে'জ, কলকাতা-৭৩, পৃঃ ১১
১৩। তদেব, পৃঃ ২৮
১৪। তদেব, পৃঃ ২৭
১৫। তদেব, পৃঃ ১১৫
১৬। তদেব, পৃঃ ৪৩
১৭। তদেব, পৃঃ ৪৫
১৮। তদেব, পৃঃ ৬৩
১৯। তদেব, পৃঃ ১০২-৩
২০। তদেব, পৃঃ ১১৫